

গল্পে গীতা

গল্পে গীতা

অধর্ম অন্যায় ও অবিচারে দেশ যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন দুষ্কৃতের দমনের জন্য, শিষ্টকে রক্ষা করার জন্য এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র

কলিকাতা—৭০০০৭৩

ভূমিকা

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে গীতা অন্যতম। যুগযুগ ধরে ভারতের মানুষ এই গ্রন্থটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠনিঃসৃত বাণীরূপে ভক্তিভরে পাঠ করে আসছে। সকলের নিকটই গ্রন্থটি পাঠ্য।

এই মহৎ গ্রন্থটি গল্পের ছলে লেখা হোল, যাতে ছোটরা এবং সদ্য সাক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিরাও অতি অনায়াসে এই গ্রন্থটির রস উপভোগ করতে পারে।

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক : রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র ৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস, ৬, শিবুবিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬

গল্পে গীতা

॥ এক ॥

আজ থেকে অনেক অনেককাল আগেকার কথা। তোমরা নিশ্চয়ই সে গল্প শুনেছ।

সে গল্প একটা ভয়ংকর যুদ্ধের গল্প। তার নাম "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ"। এখনকার দিল্লীর কাছে কুরুক্ষেত্র নামে একটা বিশাল মাঠে এই যুদ্ধ হয়েছিল। সেই-জন্যেই এর নাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। কিন্তু কেন হয়েছিল এইরকম একটা মারাত্মক যুদ্ধ? এমন সর্বনাশা যুদ্ধ তো আর শুধু শুধু হয় না। একটা কারণ অবশ্যই থাকে। তেমনি এ যুদ্ধেরও একটা কারণ ছিল।

কারণটা হচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া। যার ফলে এই বিরাট যুদ্ধে আমাদের দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছিল। বড় বড় বীর মারা গেলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে কুরুক্ষেত্রের মাঠে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। লক্ষ লক্ষ সংসার ছারখার হয়ে গেল। জ্ঞানী গুণী—সকল লোকে যাঁদের দেবতার মত ভক্তি করতো তাঁরা সব মরে গেলেন। দেশের ঐশ্বর্য সম্পদ সব নষ্ট হয়ে গেল। সে যে কী ভীষণ অবস্থা তা

আর বলে শেষ করা যায় না। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ যুদ্ধটা আবার কাদের মধ্যে হয়েছিল জান ?

সেকালে দুটি ক্ষত্রিয়রাজবংশ ছিল। যদিও তারা একই কুরুরাজের বংশধর, একই পরিবারের লোক, তবুও পাণ্ডুর যারা ছেলে ছিল তাদের লোকে বলত "পাণ্ডব"। আর ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সকলে বলত "কৌরব"। পাঁচ ভাই ছিল পাণ্ডবরা, আর কৌরবরা ছিল একশ' ভাই আর এক বোন। তার নাম দুঃশলা। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। তাঁর দ্বারা তো আর রাজকার্য দেখাশুনা করা সম্ভব নয়। সেজন্যে সকলে তাঁরই ছোট ভাই পাণ্ডুকে রাজা করলেন। কিন্তু পাণ্ডু দাদাকে দেবতার মত ভাল-বাসতেন আর ভক্তি করতেন। তিনি ছিলেন আসলে নামে মাত্র রাজা। কারণ দাদার পরামর্শ ছাড়া তিনি একটি কাজও করতেন না। দুই ভাইয়ের সংসার যেন একটাই সংসার। খুব সুখে তাঁদের দিন কাটে। রাজ্যেও কোথাও নেই কোন অশান্তি। প্রজারাও খুব আনন্দে থাকে। কিন্তু সুখ কি আর চিরকাল এক-টানা চলে ? এই সংসারটিতেও তাই ঘটলো। হঠাৎ সংসারের কোন ছেলে যদি বদমাইস আর শয়তান

হয় তাহলে যা ঘটে এই সংসারটিতেও তাই ঘটলো। রাজ্য নিয়ে আরম্ভ হয়ে গেল খুড়তুতো আর জ্যেঠতুতো ভাইদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ।

॥ দুই ॥

ধৃতরাষ্ট্রের ছিল একশত ছেলে। বড় ছেলেটির নাম দুর্যোধন। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন নকুল আর সহদেব। সকল লোকে তাদের পঞ্চপাণ্ডব বলেই জানে। তাদের গুণের তুলনা নেই। পাঁচটি ছেলেই যেন সোনার চাঁদ, আর দুর্যোধনরা তাদের ঠিক উল্‌টো যেমন শয়তানী বুদ্ধি, তেমনি হিংসুটে।

সারা রাজ্যের মানুষের একমাত্র ইচ্ছা, যুধিষ্ঠির তাদের রাজা হোল। তাঁর মত ধার্মিক লোকও আর ভূ-ভারতে নেই। কানে পৌঁছে গেল দুর্যোধনের এই কথাটা। দুর্যোধনের মাথা খারাপ্ হয়ে যায় আর কি। কী সর্বনাশের কথা! তার বাবা না হয় অন্ধ ছিলেন তাই রাজা হতে পারেননি, কিন্তু তবুও তিনিই বড়। এখন তো বড় ভাইয়ের ছেলে হিসেবে সে-ই রাজ্য পাবার অধিকারী। এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? কোন্ আইনে যুধিষ্ঠির রাজা হবেন? কাঁদতে কাঁদতে

দুর্যোধন গিয়ে হাজির হোল বাবার কাছে। বাবার বাইরে যেমন দু'চোখ অন্ধ ভিতরেও তিনি তেমনি ছেলের প্রতি অন্ধ হয়ে গেলেন। দুর্যোধন করলো কি, নানা কৌশলে পাণ্ডবদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে বসলো। তারপর রাজ্যের লোককে কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে ভালবাসা দেখিয়ে, কাউকে অর্থ দিয়ে, আর কাউকে খুব সম্মান দেখিয়ে নিজের বশে আনবার জন্য উঠেপরে লাগল। দুর্যোধন মনে মনে ভাবল, কেমন জব্দ। দেখি কি করে এবার পাণ্ডবরা আমাকে সিংহাসন থেকে তাড়ায়। এখন সারা দেশের লোক আমার দিকে। পাণ্ডবদের হয়ে কথা বলবার জন্যে মানুষ তো দূরের কথা, একটা কাকপক্ষীও নেই। দেশের যত তাবৎ তাবৎ মাথাওয়ালা লোক সব আমার দিকে। যারা আবার একটু আধটু দুর্যোধনের বিরুদ্ধে ছিল তাদের সে মোটা মোটা মাইনে দিয়েএকএকটা বড় পদে বসিয়ে দিলে, ব্যাস সব চুপচাপ। আর কেউ টুঁ শব্দটিও করে না। কারণ কূটবুদ্ধিতে দুর্যোধন একেবারে ওস্তাদ। সে জানত, টাকার লোভ আর পদের মোহ বড় কম নয়। আর দাসত্বের বীজ একেবার শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। কারণ সে জানত, সকলকে

একবার কোনরকমে গোলাম করে ফেলতে পারলেই বংশ পরম্পরায় চললো তার জের। মানুষকে যদি পশুরও অধম করে ফেলতে চাও তাহলে গোলাম করে ফেল। যারা পরের গোলামি করতে একবার অভ্যাস করেছে তাদের দিয়ে এমন কোন নোংরা কাজ এ জগতে নেই যা করানো যায় না।

কিন্তু দুর্যোধন একটু ভুল করেছিল। তার বোধ-হয় জানা ছিল না যে, এরা পাঁচজন খুব সৎ আর ভাল মানুষ হলেও বোকা নয়। রাজনীতিটা তারাও কম বুঝতো না। আর তাদের বীরত্ব—সে কথা সকলেরই জানা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, তাদের নাম শুনলেই অনেক দেবতার চোখ কপালে উঠে যেত। আর এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অর্জুন তো ছিল পৃথিবীবিখ্যাত বীর।

যুধিষ্ঠির অনেক আগে থেকেই দুর্যোধনের শয়তানির কথা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যে দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন অর্জুনকে। মানুষকে জানিয়ে দাও, দুর্যোধনের শয়তানির কথা। মানুষকে জাগিয়ে তোল এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জনতার শক্তি হচ্ছে সব থেকে বড় শক্তি। যুধিষ্ঠির জানতেন, জন-শক্তি যদি একবার জেগে ওঠে তাহলে দুর্যোধনের

শয়তানিকে ধ্বংস করা কঠিন হবে না। তার প্রকৃত রূপ খুলে যাবে মানুষের সামনে। তার ঐ রাজশক্তি জনশক্তির স্রোতে খড়ের কুটোর মত ভেসে যাবে।

পাণ্ডবরা ছিল নির্লোভ। প্রথমে তারা রাজত্বও চায়নি। চেয়েছিল সামান্য একটু সম্পত্তি, যাতে তারা কোন রকমে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু দুর্যোধন সেটুকুও দিতে রাজী নয়। তার মুখে এক কথা—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী।" কি আর করে পাণ্ডবরা। যুদ্ধ ছাড়া আর তো অন্য কোন পথ নেই। দুর্যোধনের সঙ্গে আপস মীমাংসা করার চেষ্টা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং যুদ্ধ করতেই হবে।

দুর্যোধন মহাখুশি—ভাবল ভালই হল। কারণ পাণ্ডবরা আর যুদ্ধ করবে কি করে ? কোথায় তাদের লোকজন, অস্ত্রশস্ত্রই বা তারা কোথায় পাবে ? যুদ্ধের শুরুতেই শেষ করে ফেলা যাবে তাদের। একবার তাদের যদি মেরে ফেলতে পারে তাহলেই সব শান্তি। পাপ চুকে যাবে একেবারে।

অতএব যুদ্ধই একমাত্র পথ। যুদ্ধের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। তখনকার দিনের যুদ্ধের নিয়মটা এবার একটু শোন। সেকালে আজকের মত যুদ্ধ হোত না।

এখনকার যুদ্ধ তো ভীরুর যুদ্ধ। ওপর থেকে বোমা ফেলে গ্রাম নগর ধ্বংস করে ফেলা, হসপিটাল, বিদ্যালয়, সেতু, কলকারখানা উড়িয়ে দেওয়া। দূর থেকে কামান দেগে নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা। এ সমস্ত ছিল সেকালে গর্হিত কাজ—মহাপাপ বলে মনে করা হোত। তখন যুদ্ধ হোত একেবারে সামনা-সামনি। অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, গজারোহী গজারোহীর সঙ্গে, পদাতিক কেবলমাত্র পদাতিকের সঙ্গেই যুদ্ধ করতো। যে রথে যুদ্ধ করছে, সে একমাত্র রথারোহী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতো না, আর যুদ্ধও হোত সমানে সমানে। যদি কারো হাতে অস্ত্র না থাকতো, তবে তার হাতে আগে অস্ত্র তুলে দিয়ে তবে যুদ্ধ করতে হোত। আসলে তখনকার কালের লোক ছিল প্রকৃত বীর। বীরত্বের সম্মান তারা সেইজন্যেই রাখতে জানতো। আর এখন মানুষ যত দুর্বল হচ্ছে দৈহিক শক্তির দিকে, তত মাথায় খেলছে দুর্বুদ্ধি কি করে অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা যায়, সেই দুষ্ট-বুদ্ধি মাথায় খেলা করছে। বীরত্বের মর্যাদা আজ আর সেইজন্যেই দেখা যায় না।

যাই হোক, তখনকার দিনে তো গেরিলা যুদ্ধ বা

বিমান যুদ্ধ ছিল না। ছিল সামনা-সামনি যুদ্ধ। আর সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে গেলে একটা প্রকাণ্ড মাঠের প্রয়োজন। আগেই বলেছি, বর্তমান দিল্লীর কাছে কুরুক্ষেত্র নামে একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। এখনও সেখানে গেলে কিছুটা অন্ততঃ দেখতে পাবে। ঠিক করা হোল ঐ মাঠটাতেই যুদ্ধ হবে।

দু'পক্ষেরই তাঁবু খাটানো হতে লাগল কুরুক্ষেত্র মাঠের দু'প্রান্তে। আসতে লাগল লক্ষ লক্ষ সৈন্য-সামন্ত, হাতী, ঘোড়া আর রথ। এলো নানারকমের সব ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র তীর-ধনুক বল্লম প্রভৃতি।

দু'পক্ষেরই সাজো সাজো রব। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ঘরে বসে ছটফট করছেন। তিনি তো কিছুই দেখতে পান না। কিভাবে তিনি যুদ্ধের খবর পাবেন? সেই চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছেন।

সে সময় ব্যাসদেব নামে ছিলেন এক বিরাট পণ্ডিত। যেমন তিনি বড় কবি তেমনি বড় বৈজ্ঞানিক। ধৃতরাষ্ট্র সেই ব্যাসদেবের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। বললেন, ব্যাসদেব, আপনিই একমাত্র উপায়। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিন। ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সঞ্জয়কে তোমার কাছে বসিয়ে রেখে যাচ্ছি। এমন একটা ব্যবস্থা করে রাখছি যে, সে ঘরে বসে

সব দেখবে এবং শুনবে। তারপর যা দেখবে ও শুনবে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বলবে। এ যেন ঠিক একালের বেতারের সঙ্গে টেলিভিসন যোগ করা। এ সকলে শুনতে পাবে না কেবলমাত্র যার কাছে থাকবে সে-ই শুনতে পাবে। যাক, সমস্যা মিটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র সব সংবাদ পাবেন। সঞ্জয় ঘরে বসে দেখবে সেই মহাপ্রলয়ংকরী যুদ্ধ আর বলে যাবে তার ঘটনা জন্ম-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে।

এখন প্রশ্ন "গীতা" কী?

তার উত্তরে বলবো, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে যখন যুদ্ধের সবকিছু প্রস্তুত, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সারথি হয়ে অর্জুনের রথ চালিয়ে নিয়ে এলেন, রথের চাকার সেই ঘর্ঘর শব্দে কেঁপে উঠলো পৃথিবী। কুরুক্ষেত্র মাঠের মধ্যস্থলে এসে শ্রীকৃষ্ণ রথ থামালেন। বললেন, অর্জুন শর যোজনা কর। কিন্তু ভীষণ দুর্বলতা এলো অর্জুনের মনে। সে তখন আত্মীয়-স্বজনদের মেরে ফেলতে হবে বলে যুদ্ধ করবে না ভেবে—পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের মনে দেশপ্রেম ও আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন—সেই উপদেশগুলি যে বইটিতে লেখা আছে তারই নাম "গীতা"।

আজ সেই "গীতার" কথা আমি বলবো।

এতক্ষণ ধরে তোমাদের শোনালাম, কি কারণে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধটা হয়েছিল। এবার এসো যুদ্ধের অবস্থাটা দেখি। আমরাও এখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পাশটিতে বসে সঞ্জয়-এর মুখ থেকে শুনবো যুদ্ধের আগাগোড়া ঘটনাটা। তাহলেই কি হচ্ছে না-হচ্ছে সব জানতে পারবো।

বিশাল কুরুক্ষেত্র প্রান্তর। দুই প্রান্তে সাজিয়ে রাখা হয়েছে উভয় পক্ষের অস্ত্রশস্ত্র আর সৈন্যসামন্ত। সকলেই অপেক্ষা করছে সেনাপতির আদেশের জন্যে। তাঁর আদেশ পেলেই শুরু হয়ে যাবে মহাযুদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র চুপচাপ ঘরের কোণে বসে আছেন। ধৈর্য আর থাকছে না। উসখুস করছেন। চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। তাই আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। বললেন, বাবা সঞ্জয়, কী সব দেখছ বল ; আমার মন যে আর বাগ মানছে না। আমার আর আমার ভাইয়ের ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ কী আরম্ভ হয়ে গেছে ? কারা কেমন যুদ্ধ করছে একটু বল। অবস্থাটাই বা কাদের কী রকম ?

ধৃতরাষ্ট্র এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন কেন জান? তাঁর এই উদ্বেগ তো স্বাভাবিক। তিনি অন্তরে জানতেন তাঁর ছেলেরা খুব সুবিধের নয়। তারা শয়তান, যুদ্ধটা তারা অন্যায়ভাবে করছে। আর অন্যায় কখনোই জয়লাভ করে না। চিন্তার আরো একটা বড় কারণ, একে তো অর্জুনের মত বীর পৃথিবীতে কেন, স্বর্গেও খুঁজে পাওয়া যায় না। সব বীর মিলেও অর্জুনকে ঘায়েল করা তো দূরের কথা তার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আবার যাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে সকলে পূজা করে, যাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদতলে মাথা নত করে—সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়। তিনি নিজে থেকে অর্জুনের রথের চালক হয়েছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যার পক্ষে তাকে পরাজিত করার মত বীর স্বর্গ-মর্ত্যে কোথাও নেই। একথা ধৃতরাষ্ট্র খুব ভালভাবেই জানতেন। সেই-জন্যে ভয়ে তাঁর বুক টিপটিপ করছিল।

তাঁর এখন চিন্তা রাজত্ব যায় যাক, ছেলেগুলো আবার ঘরে ফিরবে তো। শেষ পর্যন্ত না তাঁকে নির্বংশ হতে হয়। ধৃতরাষ্ট্রের ঘন ঘন প্রশ্নের জন্যে সঞ্জয় তখন বললেন, মহারাজ, কি আর আপনাকে

বলবো ; পাণ্ডবদের যা ভাবা হয়েছিল মোটেই তা নয়। তারা এত সৈন্যসামন্ত আর অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করেছে যে, বেচারা দুর্যোধন তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

কী কাণ্ড রে বাবা! এরা অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে যোগাড় করলো! এরা যা যোগাড় করেছে তা যে আমাদের থেকেও অনেক বেশী। তারপর আবার তাকিয়ে দেখলো অর্জুনের রথের সামনে শ্রীকৃষ্ণকে। যেমনি তাঁর বুকের ছাতি তেমনি লোহার মত শরীর। চোখ দুটোতে দুষ্টুমির হাসি। তিনি এক হাতে ধরে আছেন চাবুক, আর হাতে ঘোড়ার লাগাম।

এই দেখেই দুর্যোধনের মাথাটা ঘুরে উঠলো। ওই মিষ্টি হাসি মুখে মাথানো শান্ত লোকটিকে হাড়ে-হাড়ে চেনে দুর্যোধন। ছুটে গেল অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে। বললো দুর্যোধন, এ কী কাণ্ড গুরুদেব? ওরা কী আরম্ভ করেছে? ভীষ্মের মত বীর যদিও আমাদের সেনাপতি তবুও ভীম সেনাপতি হয়ে ওদিকে যে কাণ্ড শুরু করেছে তা দেখে তো ভিরমি লেগে যাবার যোগাড়।

দুর্যোধনের কথা শুনে দ্রোণাচার্য বুঝে নিলেন

সমস্ত ব্যাপারটা। তিনি খুব ভালভাবেই চেনেন দুর্যোধনকে। কতখানি যে ঘোড়েল তাও জানেন। বুঝলেন এটা দুর্যোধনের একটা রাজনৈতিক কূট-বুদ্ধি। আসলে ও বলতে চাচ্ছে, আপনাদের মত বীর থাকতেও কিনা পাণ্ডবরা এত স্পর্ধা দেখায়! এই সমস্ত কথা বলে সকলকে সে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিতে চাচ্ছে।

ভীষ্ম দুর্যোধনের এই সমস্ত কথা শুনতে পেয়ে খুব জোরে বাজনা বাজিয়ে দিতে বললেন। সে সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নানরকমের বাদ্যযন্ত্র রাখা হোত। ঐ বাজনা বাজতে আরম্ভ করলেই সকলের মধ্যে ভীষণ শক্তি জেগে উঠতো। দুর্বল লোকও উত্তেজনায় ঝাঁপিয়ে পড়তো যুদ্ধক্ষেত্রে। মরণের ভয়কে তুচ্ছ করে তারা এগিয়ে যেত। এখনও সেই কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে বাজনা বাজাবার ব্যবস্থা রাখা হয়। ভীষ্ম এরকম আদেশ দিয়েছিলেন, কারণ এইভাবে তিনি পাণ্ডবদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল দুর্যোধানের মনে সাহস সঞ্চার করা।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষেও

বেজে উঠলো বিকট বাজনা। যুদ্ধ করবে কী? সেই বাজনার শব্দেই অনেকে মূর্ছা গেল। শুরু হয়ে গেল কৌরবপক্ষে ভীষণ লুটোপুটি, কতজন যে কত-জনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল তার আর ইয়ত্তা নেই। ভাবলো, বাব্বা! আরম্ভেই যদি এই হয় তাহলে না জানি কী ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র না এরা যোগাড় করেছে। কী ভীষণ যে বীর এরা তাই বা কে জানে।

পাণ্ডবপক্ষের ব্যাপার দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখে একটু করে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। এতেই যাদের এত ভয় তারা আবার এসেছে যুদ্ধে করতে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাদের মজা। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ টান দিলেন ঘোড়ার লাগাম ধরে। অর্জুনের রথ ঘর্ঘর শব্দে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। সবাই ভাবলে এবার আর রক্ষে নেই। কেমন মুখে হাসি। দেখতে একেবারে শান্তশিষ্ট গোবেচারা, আর মনে মনে আঁটছেন হাজার রকমের প্যাঁচ। এমন শয়তান আর দেখা যায় না। ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে পেরে উঠবে এমন কেউ আছে নাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

ওদিকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বসে আছেন ঘরের মধ্যে। কি উদ্বেগেই না তিনি সময় কাটাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন তিনি সঞ্জয়কে, কী ব্যাপার সঞ্জয়, কী

ঘটছে, এখন কুরুক্ষেত্রে? সঞ্জয় বললেন, অর্জুনের রথ মাঠের মাঝখানটায় এসে হাজির হয়েছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললো, সখা এইবার রথটা একটু থামাও। যুদ্ধ করবার আগে একবার দেখে নিই কে কে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য এসেছেন। কৃষ্ণ রথখানা থামালেন, বেশ, তাই হোক। একবার চারদিক ভাল করে দেখে নাও। অর্জুন যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল খুব ভাল করে, তারপর হাতের তীর-ধনুকটাকে রথের ওপর ফেলে দিয়ে চুপচাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

কৃষ্ণের মুখে সেই দুষ্টামি হাসি। জিজ্ঞেস করলেন, কি বন্ধু! যুদ্ধ করতে এলে সেজেগুজে এখন এসব কী হচ্ছে? তীর-ধনুকটা নামিয়ে রাখলে কেন?

বিষণ্ণ মুখে অর্জুন বললো, কৃষ্ণ, এ যুদ্ধ আমি করতে পারব না।

—তার মানে? কি বলছো এসব!

দেখ কৃষ্ণ, খুব সোজা কথাই বলছি। এঁদের আমি মারবো না। যাঁরা আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার গুরুজন, প্রিয়জন বন্ধু, আপনজন। এঁদের মেরে ফেললে আমি পাপে ডুবে যাবো। আর এই সমস্ত বীর, আত্মীয়-স্বজন

বন্ধু-বান্ধবই যদি মরে যায় তাহলে কাদের নিয়ে আমি রাজত্ব করবো। কি করবো রাজ্য আর ধনসম্পদ নিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, বা! বা! একেবারে দেখছি চরম বৈরাগ্য এসে গেল। আর কি, এবার একটা লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়।

—তুমি ব্যঙ্গ করছো কৃষ্ণ। বৈরাগ্য আসবে না? আচ্ছা, এই তোমাকেই যদি আমি একটা সোনার সিংহাসন একটা শ্মশানে বসিয়ে দিয়ে ভাল ভাল রাজভোগ খেতে দিই—ভাল লাগবে তোমার? এর থেকে সত্যিই আমি বনে চলে গিয়ে ভিক্ষে করে খাবো। দরকার নেই আমার রাজত্বে, এঁরা সুখে শান্তিতে থাকুন তাহলেই আমি খুশী।

ধৃতরাষ্ট্র তো সঞ্জয়ের মুখ থেকে এই কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যাক বাঁচা গেল, এবার আমার ছেলেরা নিশ্চিন্তে রাজত্বটা ভোগ করবে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তখন বোধহয় বুঝতে পারেননি, অর্জুন এখন কার পাল্লায় পড়েছেন। দৈত্য-দানব, রাক্ষস, অসুর যাঁর শরীরের শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না—যাঁর বুদ্ধির সীমা-পরিসীমা পাওয়া যায় না—সেই শ্রীকৃষ্ণ যার বন্ধু, যার রথের

চালক আর পরামর্শদাতা, তিনি কি অত সহজে অর্জুনকে ছাড়েন।

তিনি অর্জুনের কথা শুনে খুব রেগে গেলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। একবার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে নিলেন অর্জুনের, তারপর একটু মৃদু হাসি হেসে বললেন, এমন বদখেয়াল তোমার মাথায় কি করে চাপলো অর্জুন? এ তো বুদ্ধিমান বীরের কথা নয়, কোন অনার্যের মুখ থেকে এরকম কথা শুনলে আমি অবাক হতাম না, কিন্তু তুমি আর্য হয়ে এরকম অনার্যের মত কথা বলছ কেন? অনার্যদের মধ্যেই এরকম দুর্বুদ্ধি দেখা যায়, যারা একান্ত মূর্খ— যাদের দেশে জাতি বা ধর্ম বলে কোন ধারণা নেই যারা বর্বর অসভ্য, তাদের মুখ থেকে যদি আমি এসব কথা শুনতাম তাহলে আমার কোন দুঃখ হোত না। কিন্তু তুমি এরকম কথা বলবে এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি শুধু দুঃখ পাইনি—একথা শুনে আমার আশ্চর্যও লাগছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই তিরস্কার শুনে অর্জুনও একটু বিরক্ত হলো। বললো, বা! বা! বেশ বলেছ, আমার কথাটা অনার্যদের মত হোল, আর তোমাদের আর্য-ধর্ম বুঝি বলছে—গুরুজনদের হত্যা কর, প্রিয়জনকে

খুন কর, ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাও। সুন্দর, সত্যিই সুন্দর কথা বলেছ কৃষ্ণ। আর অপরাধীকে না হয় হত্যা করা যায় কিন্তু এঁদের মধ্যে সবাই তা আর অপরাধ করেননি—এমন দোষ করেননি যাতে এই নিরপরাধ লোকগুলোকে হত্যা করতে হবে।

ধৃতরাষ্ট্রও উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছেন, তিনি আগ্রহের সঙ্গে সঞ্জয়কে বললেন, ওহে সঞ্জয়, অর্জুনের ঐ কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কী বললেন ?

সঞ্জয় বললেন, অর্জুনের ঐ সমস্ত কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

অর্জুন বুঝতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথা একেবারেই উড়িয়ে দিলেন, অর্জুনের কথাগুলো যেন তাঁর কাছে বাজে কথা, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিদ্রূপ করলেন। সেজন্য কি আর করেন, অর্জুনের কোন কথাই আর বলতে সাহস হোল না। শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কৃষ্ণকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ তিনিই পাণ্ডবদের একমাত্র ভরসা। আর তিনি অর্জুনের সমবয়সী এবং বন্ধু হলেও বিদ্যা বুদ্ধি আর

রণকুশলতায় অর্জুনের থেকে অনেক—অনেক বড়। সেজন্যে অর্জুনও তাঁকে গুরুর মত ভক্তি করতেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললেন, দেখ, ছেলেমানুষি করো না। আর ওই রকম বোকার মত কথাও বোল না। তুমি এর আগে যা বলেছ তাতে তোমার বোকামিই প্রকাশিত হয়েছে। তুমি তো জান বন্ধু! জগতের সবকিছুই ভগবানের অংশ। আর এটাও তোমার নিশ্চয় জানা আছে যে, ভগবানের ধ্বংস নেই। আর তুমি বলছ, কাউকে মারতে পারবে না, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। তুমি কি ভগবানের থেকেও বড় নাকি? তোমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে তুমি কাউকে মারতে পার?

শ্রীকৃষ্ণের এই কথাটা একটু ভাল করে বুঝে নাও। কথাটা একটু গোলমেলে ধরনের। হয়তো মনে হবে, শ্রীকৃষ্ণের কথাটা আবার কি ধরনের! পৃথিবীর সবাই যদি ভগবান হয় আর তাদের যদি বিনাশ না হয় তাহলে চোখের সামনে রোজ এত জীবজন্তু কীটপতঙ্গ মরে কেন?

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। যেমন হাওয়া, এর কোথায় যে আরম্ভ আর কোথায়

যে শেষ তা কেউই জানে না, হাওয়াকে কেউ ধরে রাখতে পারে না, চোখে দেখতে পায় না, নষ্ট করে ফেলতে পারে না, কিন্তু তবুও এমন কোন জায়গা নেই যেখানে হাওয়া নেই। এই হাওয়া দিয়ে আমরা কত না কাজ করছি, গাড়ির চাকায় ভরে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি, ফুটবলের ব্লাডারে ভরে বল খেলছি, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে বেঁচে আছি। জগৎজুড়ে রয়েছে এই অদৃশ্য হাওয়া।

এই হাওয়া যখন চাকায় ভরে গাড়ি চালাচ্ছি বা ব্লাডারে ভরে বল খেলছি তখন কি বলি হাওয়ার দ্বারা গাড়ি চলছে বা বল খেলছি? আবার সব থেকে মজার ব্যাপার কি জান—যখন টায়ারটা বা ব্লাডারটা ফেটে হাওয়াটা বেরিয়ে যায় তখনই তা অকেজো হয়ে যায়, তখন আমরা বলি চাকাটা বা ব্লাডারটা নষ্ট হয়ে গেল। একবারও বলি না হাওয়াটা নষ্ট হয়ে গেল।

তেমনি এই জগৎ। ভগবান অদৃশ্য থেকে আমাদের চালাচ্ছেন। অথচ একবারও আমরা ভগবানের নাম করি না। আর আমরা বলি সব-কিছু আমরাই করছি। অথচ কেউই আমরা কিছুই করি না। সবই ভগবান করাচ্ছেন। আবার ওই

ব্লাডারের হাওয়ার মত যখন ভগবান দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—তখন আমরা হায় হায় করে উঠি—আহা, অমুক লোকটা মারা গেল! কিন্তু সব ভুল। মানুষ মরে না। সে ভগবানে মিশে গেল। পড়ে থাকলো দেহের খোলস বা পোশাকটা। গায়ের জামাটা যখন ছিঁড়ে যায় তখন কি বলি—আমি ছিঁড়ে গেলাম। বলি, জামাটা ছিঁড়ে গেল।

আসলে দেহটা সব নয়, সত্যি হচ্ছে আত্মা। দেহটা ধ্বংস হলেও আমার কামনা-বাসনা-আশা আকাঙ্ক্ষা সবকিছু জড়িয়ে থাকে যা, তা হোল আত্মা। সময় হলেই আত্মা আবার অন্য একটা দেহের খোলস গায়ে চাপিয়ে নেয়।

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অর্জুনকে অনেক যুক্তি দেখালেন। কিন্তু কথাগুলো যেন তাঁর মনে ধরছে না। একইভাবে তিনি চুপচাপ করে বসে আছেন। ভীষণ বিরক্তি এসে গেল শ্রীকৃষ্ণের, দু'দিকেই যোদ্ধারা যুদ্ধের নেশায় মেতে উঠেছে। আর ঠিক সেই সময়ে অর্জুনের এই ন্যাকামি শ্রীকৃষ্ণের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। আত্মীয়-স্বজনদের ওপর এতই যদি তাঁর দরদ তাহলে এত কাণ্ড করবার কি দরকার ছিল? হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সবকিছু যোগাড়যন্তর করে

যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বলে কি না—যুদ্ধ করবো না। ঠিক আছে, দেখা যাক, অর্জুন যুদ্ধ করে কি না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কাপুরুষের মত বদনাম ঘাড়ে করে তোমাকে আমি ফিরে যেতে দিচ্ছি না। দুর্যোধনের মত একটা পাষণ্ডের হাতে দেশের নিরীহ মানুষগুলোকে ফেলে তুমি ভীরুর মত পালাবে তা আমি হতে দেব না।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, তত্ত্বকথা বলে অর্জুনকে বোঝানো যাবে না। সেইজন্যে তত্ত্বকথা ছেড়ে সহজ কথায় বোঝাতে শুরু করলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ মহা ধুরন্ধর ব্যক্তি, তাঁর মত কূটনীতি-বিশারদের সঙ্গে অর্জুন পেরে উঠবেন কেন ?

তিনি বললেন, দেখ অর্জুন, সর্বদাই মনে রাখবে, প্রাণীর কাছে নিজের থেকে প্রিয়বস্তু আর নেই। পৃথিবীতে প্রাণের দামের কাছে অন্যকিছু দামের তুলনা চলে না। সেইজন্যে মানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে কথা বললে মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বিশেষ করে অর্জুনের মত লোক, যাঁদের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের যদি আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে তো একেবারে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে ঘা দিলেন একেবারে আসল জায়গায় অর্থাৎ আত্ম-মর্যাদায় আঘাত। বললেন—দেখ বন্ধু, বড় বড় কথা ছেড়ে দিয়ে সহজ কথায় বলি, কোন রকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকাটাই মানুষের কাছে যথেষ্ট—না সেটাই মনুষ্যত্বের পরিচয় ? বেঁচে তো কুকুর-বেড়ালও থাকে, তাহলে তোমার সঙ্গে একটা কুকুর-শেয়ালের পার্থক্য কোথায় ? তোমাকে কি জন্যে মানুষ, আর কুকুর বেড়ালকে জীবজন্তু বলে—বলতে পারো ? তোমার মত একজন বীর যার স্বর্গ-মর্ত্যে এত খ্যাতি, সে যদি আজ যুদ্ধ না করে চলে যায় তাহলে লোকে কি দুর্নাম রটাবে জানো ? সারারাজ্যের লোকে বলবে—দেখ, অর্জুনকে আমরা কত বড় বীর ভাবতাম অথচ আসলে সে একজন ভীরু কাপুরুষ, তাই ভয়ে পালিয়ে গেল, আর কৌরবপক্ষ তো বুক চাপড়ে বলতে আরম্ভ করবে—কেমন বাছাধন, ভারি যে যুদ্ধের শখ হয়েছিল, মাত্র এই ক'টা সৈন্য দেখেই দে ছুট !

এইরকম কতরকম বিদ্রূপ তোমাকে সহ্য করতে হবে আর কৌরবদের স্পর্ধাও বেড়ে যাবে হাজার গুণ। এতদিন কৌরবরা তোমাদের ভয়ে দেশের মানুষের উপর অত্যাচার করতে সাহস পেতো না। ভাবতো, যদি অত্যাচার করি তাহলে শত্রুপক্ষ আছে পাণ্ডবরা,

তারা এসে গলা টিপে ধরবে। কিন্তু আজ যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ না করে পালিয়ে যাও তাহলে ওদের সাহস বেড়ে যাবে। ওরা নির্বিচারে দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাবে, দেশটাকে শ্মশান করে ফেলবে। তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবছো স্বার্থপরের মত। দেশের নিরীহ মানুষগুলোর কথা একবারও চিন্তা করছো না।

ধন গেছে মান গেছে, আছে শুধু তোমার বীরত্বের খ্যাতিটুকু, সেটুকুও বিসর্জন দিতে তোমার লজ্জা লাগবে না? লোকের সামনে মুখ দেখাবে কি করে? যুদ্ধ করে যদি মরো তবুও লোকে বলবে, হ্যাঁ, লোকটা বীরের মত যুদ্ধ করে মরেছে। কিন্তু যুদ্ধ না করে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে থেকে যে দুর্নাম ভোগ করবে তার থেকে তোমার মরে যাওয়াও ভাল। মনে হচ্ছে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। নিজের আত্মসম্মানটুকু পর্যন্ত তুমি হারাতে বসেছো, এ কলঙ্ক শুধু তোমার একার নয় অর্জুন, এ কলঙ্ক লাগবে তোমার ভাইদেরও। তারাও তোমারই জন্যে কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। শুধুমাত্র তোমার এই ভীরুতার জন্যে এত বড় একটা বংশের মুখে কালি পড়বে? আর তাছাড়া তুমি

আমার অবস্থাটা ভেবে দেখেছো কি ? তুমি এত বড় কাপুরুষ আগে জানতে পারলে আমি কী আসতাম তোমাদের নেতৃত্ব দিতে ? ছিঃ! তোমার জন্যে আমারও মান-মর্যাদা থাকছে না দেখছি।

অর্জুন বুঝলেন, এ এক মহাফ্যাসাদ। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অত্যন্ত ভালবাসেন। কৃষ্ণকে চটালে চলবে না, তাতে রাজ্য রসাতলে যাবে, কিন্তু তবুও অর্জুন মনের দুর্বলতা ছাড়তে পারছেন না। তিনি মাথা চুলকাতে লাগলেন ভয়ে ভয়ে, আর কৃষ্ণ অর্জুনের সেই একই অবস্থা দেখে একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। বললেন—এখনো তুমি মন-স্থির করতে পারলে না ? তোমার কি ধর্মকেও ভয় নেই ? যে লোকের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নেই তার মতো মহাপাপীর সঙ্গে কথা বলাও যে মহাপাপ।

অর্জুন এই কথা শুনে একটু রুষ্ট হয়ে উঠলেন। বললেন, কি বলছ কৃষ্ণ ? আত্মীয়-স্বজনকে বধ করা, গুরুকে হত্যা করা তুমি ধর্ম বলছো ?

কৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে বললেন, হ্যাঁ, সেটাই ধর্ম। তুমি কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম সে সম্পর্কে আমার থেকে বেশী বোঝ ? আর আমার ওপর তোমার অবিশ্বাসও তো কম নয়, আমি বন্ধু হয়ে তোমাকে

পাপকাজে উৎসাহ দিচ্ছি, এটাই শেষ পর্যন্ত তোমার ধারণা হোল ?

খুব পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখ, কে তোমার গুরু ? কে তোমার আত্মীয়-স্বজন ? যারা সামান্য স্বার্থের জন্যে তোমাদের সবকিছু কেড়ে নিলো, এক টুকরো থাকবার জায়গা পর্যন্ত দিতে চাইলো না, যারা চির-কাল শত্রুতা করে এলো তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের মারতে এলো, তারা হোল তোমাদের আত্মীয়, বড় আপনার জন, তাই না ? এদেরই জন্যে দরদে একে-বারে বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার। আহা কী দরদ !

আর গুরু কাকে বলে ? বয়সটা বেশী হলেই বুঝি গুরু হয় ? তাহলে পাথর, গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, গাছপালা তারাও গুরু ? যাও ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের ধুলো নিয়ে এসো।

তুমি কাদের গুরু বলছো অর্জুন ? ভীষ্ম, দ্রোণ, এঁরা গুরুর মর্যাদা পাওয়ার মত কোন্ কাজটা করেছেন বল তো ? তাঁরা শৌর্য-বীর্য হারিয়েছেন, সমস্ত সদ্‌গুণকে বিসর্জন দিয়েছেন। বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের মনুষ্যত্বকে। তা যদি না হোত, তাঁদের এত বীরত্ব থাকতেও তাঁরা দুর্যোধনের কেনা চাকর হয়ে থাকতেন না। দুর্যোধন যখন প্রকাশ্য

রাজসভায় গৃহবধূ দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এসে জঘন্যভাবে অপমান করলো, তখন ওই মাইনেকরা বীর নামের চাকরের দল হো-হো করে দাঁত বের করে হাসলেন। দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দিলেন সমস্ত রকম পাপকার্যে, আবার এখন সেই নির্লজ্জের দল তোমাদের মারবার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে জড় হয়েছেন। শাস্ত্রকে যদি সম্মান কর, আমার প্রতি যদি এক বিন্দুও বিশ্বাস থাকে, তাহলে সবার আগে তোমার ওই গুরু নামধারী পাষণ্ডদের বধ করতে হবে। ওঁদের মারলে তোমার পাপ হওয়া তো দূরের কথা মহাপুণ্য হবে, আর যদি তা না পার তাহলে তুমি হবে মহাপাপী, তোমার নরকেও স্থান হবে না।

আর তাছাড়া, তারা শুধু তোমাদেরই সর্বনাশ করতে বসেননি। তাঁরা সমগ্র দেশ এবং জাতির সর্বনাশ করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা জানেন তোমাদের ধ্বংস করতে পারলেই দেশটাকে ধ্বংস করার সুবিধে হবে, কারণ এখন দেশবাসীর ওপর অত্যাচার করতে গেলে তোমরা বাধা দেবে। তাই দুর্যোধন আগে তোমাদের ধ্বংস করতে চায়। তারপরই সে দেশের ওপর চালাবে প্রবল অত্যাচার।

এরা আর সকলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে আগে থেকেই। দুর্যোধন জানে, মুখে যত বড় বড় বাণীই দিক, কাজের সময় ওঁরা পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়বেন, লেলিয়ে দিলে গোটা জাতটার সর্বনাশ করতে এগিয়ে যাবেন। তাহলেই তুমি বুঝতে পারছো অর্জুন, এঁরা দেশ ও জাতির কত বড় শত্রু, এঁদের বাঁচিয়ে রাখলে কত বড় মহাপাপ তুমি করবে সেটা এখন বুঝতে পারছো ?

তুমি কয়েকটা শয়তানকে মারতে গিয়ে বলছো, মহাপাপ হবে। আর এঁরা যখন কোটি কোটি মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করবেন তখন বুঝি সেটা দেখে তোমার পাপ হবে না ? সে পাপের বোঝা তুমি বইতে পারবে ?

কোন অত্যাচারী প্রবল শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে আগেই তাঁদের যে সমস্ত বড় বড় সহায় আছে তাঁদেরকে ধ্বংস করলেই তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়বে। একটা গাছকে যদি নষ্ট করে দিতে চাও তাহলে একেবারে তার মূল শিকড়টাকে কেটে ফেলতে হবে, তা না করে যদি গোড়াটা কেটে দাও, গুঁড়ির চারধারে আরও অনেকগুলো গাছ গজাবে। সুতরাং অত্যাচার যদি ধ্বংস করতে হয় সমূলে ধ্বংস কর।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই হচ্ছে তোমার ধর্ম—বীরের ধর্ম। দুর্বলকে অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করাকে হিংসা বলা যায় না। একটা বাঘ যদি গ্রামের মধ্যে ঢুকে দিনের পর দিন মানুষকে খেয়ে ফেলে, তুমি বাঘটাকে মারতে পারো জেনেও কি পাপ হবে বলে মারবে না? বলবে নাকি, আহা, জীবহত্যা মহাপাপ! তা যদি বলো তাহলে তোমাকে মহামূর্খ ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। হিংস্র একটা জন্তুকে মারলে পাপ হবে আর এত লোককে যে মেরে ফেলছো তাতে বুঝি তোমার পাপ হবে না? প্রতিকার করার ক্ষমতা থাকতেও তুমি করলে না, এটা বুঝি পাপ নয়?

পাপকে দেশ থেকে দূর করাটা হিংসা নয়—সেইটাই অহিংসা।

আর একটা কথা ভেবে দেখ—তুমি যে পাপের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছো সেই পাপ সত্যিই কি তোমাকে ছেড়ে দেবে? দেবে—না। বরঞ্চ তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেই ধ্বংস করার জন্যে ছুটে যাবে।

তুমি নিশ্চয় জানো, দুর্যোধন একজন শয়তান মানুষ। তুমি যুদ্ধ না করে যখন পালিয়ে যাবে তখন

সে দেশের মানুষের ওপর করবে নির্মম অত্যাচার। তুমি হয়ত তখন কোন বনে বাস করছো। তখন কি তোমার মনে হবে না পাপাত্মা দুর্যোধন আমার দেশের মানুষকে কত কষ্ট দিচ্ছে? তখন মনে হবে না, আমার ক্ষমতা ছিল তবুও আমি কেন তাকে শাস্তি দিইনি? যদি শাস্তি দিতাম তাহলে সে আজকে আমার দেশবাসীর ওপর এত অত্যাচার করতে সাহস পেত না। দুর্যোধনের অত্যাচারের নিত্য নতুন কাহিনী তোমার কানে এসে যখন পৌঁছাবে তখন তোমার মনের অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছো।

পাপ কাকে বলে জান। প্রতিটি মুহূর্তে যা মানুষকে কষ্ট দেয়। মনকে তিলে তিলে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। তাহলে তুমি পাপের হাত থেকে কিভাবে রেহাই পেলে বল? যতদিন বেঁচে থাকবে তোমাকে এই পাপের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে।

তার থেকে যুদ্ধ কর। পাপকে ধ্বংস কর। তখন দেখতে পাবে তুমি কত শান্তিতে আছ। যখন তুমি দেখতে পাবে, তোমার জন্যে দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে আছে তখন তোমার প্রাণে কতখানি আনন্দ

হবে বল তো ? ওই আনন্দটাই ধর্ম। দুঃখকেই বলা হয় পাপ আর সুখই হোল ধর্ম—সে নিজের জন্যেই হোক আর পরের জন্যেই হোক।

আমি বুঝতে পারছি, তুমি মনের এই দ্বিধাভাবটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারছো না। এটাও পাপ বলে জানবে।

সেইজন্যে তোমাকে বলছি, দেশের কল্যাণ করতে গিয়ে না হয় কিছুটা পাপই করলে। যদি কিছুটা পাপ করে পাপের জন্যে কিছুদিন নরক ভোগ করে লোকের ভাল করতে পার তাহলেও তো একটা সান্ত্বনা পাবে। তোমার এই মহৎ কীর্তি আর দেশ-প্রেম জগতের মানুষ চিরকাল মনে রাখবে, তোমাকে পুজো করবে। তুমি কি সেটা চাও না। জগতের নিয়মই হচ্ছে—যারা পৃথিবীতে বিখ্যাত তাদেরই লোকে যুগ যুগ ধরে পূজো করে। তাদের দৃষ্টান্ত মানুষ যুগ যুগ ধরে অনুসরণ করবে। নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে মানুষের ভাল করবার চেষ্টা করবে।

আর একটা কথা—মানুষের ভালবাসারও একটা দাম আছে এবং সেটাও একটা ঋণ, ঋণশোধ করাও প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এই যে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে

আজকে এত লোক তোমার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছে তাদের কি স্বার্থ আছে বলতে পারো ? তোমাকে তারা ভালবাসে মাত্র সেইজন্যে। আর সেই প্রতিদান হিসেবে তাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে চলে যাওয়াই কি তোমার বড় ধর্ম হোল ?

বন্ধু অর্জুন, তুমি তো জান এ জগতে কোন কাজ না করলেও আমার চলে ; কিন্তু তবুও আমাকে সারাক্ষণ কাজ করতে হয়। এই যুদ্ধে আমার কি কোন স্বার্থ আছে ? তবুও আমি যুদ্ধ করতে এসেছি। কারণ আমি জানি, মানুষ আমাকে ভালবাসে, ভগবান বলে আমাকে পুজো করে। এই ভালবাসার ঋণ আমি শোধ দেবো কি করে ?

সেইজন্যে আমাকে সবসময় মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে হয়। আমি মানুষের মঙ্গল চাই। মানুষ যাতে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি থাকে সেইটা দেখানোর জন্যেই এই যুদ্ধে আমি এসেছি। তোমাকে মানুষ ভালবাসে সেইজন্যে মানুষের মঙ্গলের জন্যেই যুদ্ধ করা তোমার উচিত।

অর্জুন বললেন, আচ্ছা কৃষ্ণ, যুদ্ধে যে আমি জিতবই তার কি কোন মানে আছে। আমি তো মরেও যেতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মরে তো যেতেই পার। তবুও সেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তখন সকলে বুঝতে পারবে, দেশ ও জাতির জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই বড় ধর্ম। মনে রেখো, নিজের ধর্মে মৃত্যুও ভাল ; তবু পরের ধর্ম আঁকড়ে থেকে কোন লাভ নেই।

অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ধর্মের কথা এলো কি করে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধ করা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের বড় ধর্ম আর কিছু নেই। ধর্ম কাকে বলে জান ? যা ধরে রাখে অর্থাৎ রক্ষা করে, বাঁচিয়ে রাখে, সেটাই আমাদের ধর্ম।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, কিসে আমাদের ধরে রাখে বা বাঁচিয়ে রাখে। তার উত্তরে বলবো—মাটি। মাটি আমাদের ধরে রাখে বা বাঁচিয়ে রাখে। মাটির বুকের ফসল খেয়ে বেঁচে থাকি। এই মাটিকে আমরা ভালবাসি। এই মাটি তোমার জন্মভূমি, তোমার নিজের দেশ। সেই জন্মভূমি তোমার অধিকারে থাকলে তুমি সেখানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পার, তার ফসল তার সম্পদ ভোগ করে জীবন কাটাতে পার। কিন্তু সেই জন্মভূমি যদি অপরের হাতে চলে যায় তাহলে তোমার বাপ-ঠাকুর্দার

ভিটেতে বসবাস করবার অধিকার পাবে না। যদিও থাকতে পাও তবুও ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। এটা কত বড় পাপ বল তো। তোমার নিজের জিনিসের ওপর নিজের যখন কোন অধিকার থাকে না তার চেয়ে দুঃখ, এর চেয়ে পাপ আর কাকে বলে অর্জুন।

নিজের ধর্মে থেকে অর্থাৎ স্বধর্মে মরাও ভাল, এককথায় প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বধর্মকে অর্থাৎ নিজের দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি মরতে হয় সেটাও ভাল। সত্যিকারের ধর্ম হচ্ছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, তাই মুনিঋষিরা বলেছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে। তাঁরা বলেছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে পুণ্য, আর না মানা হচ্ছে পাপ। তাই তাঁরা বলেছেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। পৃথিবীতে সমস্ত কর্তব্যের মূলই হোল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কথাটারও একটা গভীর মানে আছে। সর্বদাই মনে রাখবে, দেশও যা আমিও তাই। দেশটাই আমি, এই বোধটাকেই বলা হয় দেশাত্মবোধ। দেশের লোককে আপনার মনে করা তাদের রক্ষা করবার জন্যে আমি যদি মরেও যাই তাহলে আমার মৃত্যুর পর আমার আপনার জনদের দেশের লোক দেখবে।

এইবার অর্জুন তুমি হয়ত বলবে,—যাদের মারতে বলছো তারাও আমার দেশের লোক—আমার ভাই। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এরা একেবারে দেশকে আপনার ভাবতে ভুলে গেছে। নিজের আত্মীয়-স্বজন, ভাই, বন্ধুকে তারা আজ পর ভাবছে। এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না। তুমি কি ভাবছো এরা হাতে ক্ষমতা পেলে রাজ্যের লোকদের সুখে শান্তিতে থাকতে দেবে?

সেইজন্যেই আমি বলছি, এরা তোমার গুরু নয়, মূর্তিমান, এক-একটি জীবন্ত পাপ, এদের মেরে ফেলা সব থেকে আগে দরকার।

আর এরা কি সত্যিই বেঁচে আছে বলে মনে কর? এরা অনেক আগে মরে গেছে। শৌর্য-বীর্য বিদ্যা-বুদ্ধি থাকতেও যারা পরের হাতের পুতুল হয়ে থাকে, যারা নিজেদের বিবেককে পরের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে, পরের কাছে তারা তো বেঁচে থেকেও মরা ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি ওদের মারলে নিমিত্তের ভাগী হবে মাত্র।

ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কাজ করতে যায় তাদের মধ্যে জাগে অসীম শক্তি। তারা যদি দুর্বলও হয় তাহলেও বেশীর ক্ষেত্রে তারাই জয়ী হয়ে আছে।

আর যারা অন্যায় কাজ করতে যায় তাদের গায়ের জোর থাকলেও মনে মনে কিন্তু তারা থাকে ভীষণ দুর্বল। তারা কখনোই জয়লাভ করতে পারে না।

তুমি মাতৃভূমিকে দুষ্টের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধ করতে চলেছো—দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্যে লড়াই করতে যাচ্ছ আর ওরা যুদ্ধ করতে চলেছে দেশবাসীকে মারবার জন্যে—দেশের সর্বনাশ করবার জন্যে। সুতরাং এখানে শক্তিটা কার বেশী—তোমার না দুর্যোধনদের ?

এরপরই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বললেন, দেখ আজ তোমাকে আমি যে সমস্ত কথা বললাম ঠিক এই কথাগুলোই তোমার পূর্বপুরুষ সূর্যদেবকেও বলেছিলাম। সেই উপদেশগুলো যতদিন মেনে চলেছে ততদিন দেশে ছিল শান্তি, ছিল শৃঙ্খলা, মানুষের ছিল সুমতি। কিন্তু আজ দেখছি, মানুষ আর সেইসব মানতে চাইছে না। সেইজন্যে আবার নতুন করে বোঝাতে হচ্ছে তোমাকে। অথচ তুমি সে কথা কানেই তুলছো না।

অর্জুন খুব অবাক হয়ে বললেন, সে কি হে কৃষ্ণ, তুমি আমি তো এক বয়সী, আর তুমি বলছো, সূর্যদেব অর্থাৎ যাঁর থেকে ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি সেই সূর্যদেবকে তুমি উপদেশ দিয়েছো। আমাকে তুমি

কি এমনি বোকা পেয়েছো যে, যা তা বলে গেলেই বিশ্বাস করবো।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, সেইজন্যেই তো এত কথা আমাকে বলতে হচ্ছে বন্ধু—তুমি তো জান, মানুষ একবার জন্মায় না আর মৃত্যুও একবার হয় না। সেই সুর্যদেব যে সময়ে ছিলেন হয়তো সে সময় তুমিও পৃথিবীতে ছিলে। আবার পরজন্মেও হয়ত তুমি পৃথিবীতে আসবে মানুষ হয়ে। এইভাবে বারং-বার জন্ম হয় মৃত্যু হয়। তবে আগের আগের জন্মের কথা কারোর হয়ত মনে থাকে কারোর হয়ত থাকে না, তফাতটা শুধু এইখানে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি শ্রীকৃষ্ণ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মানুষ মাত্রই ভগবানের ছোট বড় অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু যত্ন এবং চেষ্টার ফলে কারোর মধ্যে সেই শক্তিটা জেগে থাকে। তখন দেখা যায়, সেই মানুষের মধ্যেই এমন শক্তি রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। আর তখন মানুষই সেই মানুষকে ভগবান বলে পুজো করে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। এই দেখ, আমি আমার ভেতরের ভগবানকে সাধনার দ্বারা জাগিয়ে তুলেছি। তাই আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সব কথা আমার মনে থাকে। আমি যা করতে পারি তা তুমি করতে পার না। সবকিছুই চেষ্টা দ্বারা, সাধনার দ্বারা করা

যায়। একই গুরুর কাছে যেমন তোমরা সকলে ধনুক চালনা শিক্ষা করেও তোমার মত কেউ বীর হতে পারলো না। তার কারণ তোমার মত একমনে ধনুক চালনার সাধনা কেউ করেনি। সেইজন্যে বলছি আমি তোমার পূর্বপুরুষদের গুরু ছিলাম একথা অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

অর্জুন আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা পৃথিবীতে মানুষ বারবার ঘুরে আসে কেন বলতে পার ?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মানুষ বারবার পৃথিবীতে আসে তার কারণ কামনা বাসনা। যতক্ষণ তোমার মধ্যে কামনা বাসনা থাকবে ততক্ষণ তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

অর্জুন বললেন, তাই যদি হবে তাহলে তুমি তো কামনা বাসনা মুক্ত, তুমি নিজের ভেতরের ভগবানকে জাগিয়ে তুলেছো, তুমি তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তবু তুমি পৃথিবীতে আসো কেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আসলে কি জান অর্জুন, আমিও কামনা বাসনা মুক্ত নেই। এই সুন্দর পৃথিবী, এই পথিবীর মাটির মানুষগুলোকে আমি বড় ভালবাসি। তাদের এত ভালবাসি যে, পথিবীতে মানুষের মাঝখানে না এসে আমি থাকতে পারি না। তাই ছদ্মবেশে কখনো কারোর ছেলে হয়ে, ভাই হয়ে, বন্ধু হয়ে, পিতামাতা হয়ে, মানুষের মাঝখানে থাকার আনন্দ আমি ছাড়তে পারি না বন্ধু।

কিন্তু আবার যখন দেখছি, পৃথিবীতে পাপ বেড়ে যাচ্ছে, অন্যায় চলছে, অধর্ম দেখা দিয়েছে তখনই অধর্ম অন্যায়কে ধ্বংস করার জন্যে ভূমিকম্প, মহামারী বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়ঝঞ্ঝার রূপ ধরে পৃথিবীতে আসি। সেটাও আমার আর একটা রূপ।

জিজ্ঞেস করবে হয়ত, এ আবার কি রকম কথা ? ভগবান তো মঙ্গল করেন। তাহলে অন্যায় পাপ যখন সকলে করছে না তখন ভগবান সকলকে ধ্বংস করেন কেন ? বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প তো বেছে বেছে কেবল অধার্মিক, পাপী, অন্যায়কারীকে ধ্বংস করে না। এগুলো তো কত নিরীহ মানুষকেও ধ্বংস করে—তাহলে।

এর উত্তর ভগবান মৃত্যুর রূপ ধরে এসেও মানুষের কল্যাণ করেন। আসলে একদল যখন অন্যায় করছে তখন আর একদল সহ্য করছে কেন। পাপ করাটা যেমন অন্যায়, পাপ সহ্য করাটাও তো তেমনি অন্যায়। পাপের প্রতিরোধ করতে হবে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে না দাঁড়ানোও যে মহাপাপ, নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা চরম অপরাধ। সর্বদাই মনে রাখবে, অন্যের পাপে কেউ মরে না, সকলেই মরে নিজের নিজের পাপে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে অবশ্যই অনেককে মরতে হবে ; কিন্তু অত্যাচারীর অত্যা-

চারেও তো অনেককে মরতে হচ্ছে। তাহলে ঐ পাপ দূর করার জন্যে, অন্যায়কে হটিয়ে দেবার জন্যে, সবাই একজোট হয়ে যদি এগিয়ে আসে তাহলে এক সময়ে হয়ত কয়েকজনকে মরতে হবে; কিন্তু তার পরবর্তী মানুষগুলো সুখে শান্তিতে বাঁচতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি জানি এ যুদ্ধে তোমার কেন এত দুর্বলতা আসছে। তুমি ভাবছো, আহা! নিজের সামান্য স্বার্থের জন্যে, সামান্য এক-টুকরো রাজ্যের জন্যে এত লোককে হত্যা করবো—তাই না?

অর্জুন চুপ করে রইলেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন, তুমি এ যুদ্ধটা নিজের জন্যে করছো একথা ভাবছো কেন। এ যুদ্ধ তোমার নিজের জন্যে নয়। তোমার দেশের জন্যে। তোমার জাতির মঙ্গলের জন্যে। তুমি দেশবাসীর মালিক নও, মনে কর, তুমি তাদের সেবক। অত্যাচারী দুর্যোধনের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করে যদি আনতে পার তাহলে তোমার দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকবে। নর-নারায়ণের সেবকরূপে তুমি করে যাবে তাদের জন্যে কল্যাণ কাজ। তোমার স্বার্থ এখানে কোথায়। এই হোল যোগ, এই হোল সন্ন্যাস। নিজের সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে যাঁরা জগতের মঙ্গলের জন্যে

জীবন দান করেন তাঁরাই হলেন আসলে যোগী, সন্ন্যাসী। হে অর্জুন, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। সেইজন্যে আমি চাই তুমি সেইরকম যোগী, সন্ন্যাসী হও। কর্মযোগকেই আমি সবথেকে বেশী ভালবাসি।

অর্জুন বললেন, সবকিছুই আমি বুঝলাম; কিন্তু তবুও আমি কিছুতেই মনে জোর পাচ্ছি না। মানুষের এরকম কেন হয় একটু বুঝিয়ে বলবে ?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখো বন্ধু, মানুষের মনের দুটো দিক আছে। একটা ভাল দিক আর একটা খারাপ দিক। যাকে তোমরা বল সুবুদ্ধি আর কুবুদ্ধি। কুবুদ্ধিরই ক্ষমতা বেশী। সেইজন্যেই দেখবে, মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লোভের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু যারা খুব ভেবেচিন্তে বুঝেসুঝে চলে তারা কোন লোভ বা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। সেইজন্যে তোমাকে বলছি বেশ ভেবেচিন্তে ভালমন্দ বিচার কর। দেখবে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত জোর এসে গেছে। কেউ তখন তোমাকে কোন কাজে আর আটকাতে পারবে না। কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। সমস্ত বাধা তোমার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে।

মানুষ যখন মানুষ আর ভগবানকে আলাদা করে দেখে তখনই সে দুর্বল বোধ করে নিজেকে। একবার মনে কর, মানুষই ভগবান, তাহলে তুমি

সেই মানুষের জন্যে সবকিছু করতে পারবে। নিজের মধ্যের ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না বলেই আমাদের পতন ঘটে—আমরা নিজেদের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলি। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস রাখ—নিজেকে হারিয়ে জাগরিত কর। নিজেকে যদি হীন মনে কর, ছোট মনে কর, তাহলে তার মত পাপ আর নেই। তুমি মনে রেখো, তুমিই ভগবান, নারায়ণের সেবার জন্যে অস্ত্রধারণ করেছো, তোমাকে হারাবার শক্তি এই পৃথিবীতে কারোর নেই।

অর্জুনের মনে তখনো সন্দেহ, সকলেই যদি ভগবান হয় তাহলে কাকে মারবো ? মানুষকে মারা মানেই তো ভগবানকে মারা।

আসলে কিন্তু তা নয়। যখন শরীরের কোন এক জায়গায় একটা ফোড়া হয় তখন তার যন্ত্রণায় তুমি ছটফট করছো। কি করবে তখন? আহা! শরীরের কষ্ট হবে বলে তাকে রেখে দেবে ? যদি রেখে দাও সেটা শেষ পর্যন্ত পচে নালী ঘা হয়ে সারা দেহটাই পচিয়ে তুলতে পারে। সেইজন্যে শরীরটাকে রক্ষা করবার জন্যে, সেই ফোড়াটাকে কি কেটে ফেলা উচিত নয় ?

তেমনি যারা ভগবানের অংশ হয়েও ঐ রকম বিষাক্ত ফোড়ার মত দেশ ও জাতির ক্ষতি করেছে, সকলের কল্যাণের জন্যে তাদের ধ্বংস করতেই হবে।

এত উপদেশ এত বাক্যব্যয়েও অর্জুনের মন স্থির হোল না। তখনও তার মনে সন্দেহ। তখন অর্জুনের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সেই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের মাঝখানে স্থির দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকালেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, অর্জুন একবার তাকাও আমার দিকে।

মুহূর্তে অর্জুনের চোখের সামনে থেকে নিভে গেল সমস্ত আলো। অর্জুনের চোখের সামনে পৃথিবী নেই—মানুষ নেই। দেখলেন, হাজার হাজার সুর্য চন্দ্র বিরাট গ্রহ নক্ষত্র তাঁর চোখের সামনে তীব্র বেগে ঘুরছে জ্বলছে। তাদের এমন ভীষণ তেজ যেন তাঁকে পুড়িয়ে ফেলছে। পরমুহূর্তেই দেখতে পেলেন, পৃথিবী জুড়ে জ্বলছে দাউ দাউ করে আগুন। দেখলেন, বিশাল এক আকাশজোড়া আগুনের মত মুখের ভেতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢুকে যাচ্ছে।

এমনি সব ভীষণ ব্যাপার দেখে অর্জুন ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। জোড়হাত করে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, তুমি আমাকে দয়া করে বাঁচাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দেখতে পারছি না এই সমস্ত ভীষণ দৃশ্য। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, চোখ মেলতে পারছি না।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কেন, দেখ, তোমাকে আমি যা

কিছু দেখাচ্ছি সবই তো মানুষের চেয়ে বড়, দেখে নাও "বিশ্বরূপ", এখনি হাঁপিয়ে উঠলে কেন।

অর্জুন বললেন, না কৃষ্ণ, এখন আমি বুঝতে পারছি, জগতে মানুষের থেকে সুন্দর কিছু নেই। পৃথিবীতে মানুষের চেয়েএমন কিছু নেই যা মানুষকে শান্তি দিতে পারে, আরাম দিতে পারে, আনন্দ দিতে পারে। আমি এই সমস্ত দেখতে চাইছি না, তুমি আমাকে মানুষ দেখাও।

তাহলে তো বুঝতে পেরেছো যে মানুষের থেকে প্রিয় জিনিস পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

অর্জুন বললেন, নিশ্চয়, তুমি আমাকে মানুষের মধ্যে নিয়ে চল, আমি মানুষের মধ্যে থাকতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। অর্জুন দেখলেন, সেই দৃশ্য চলে গেছে, সামনে মানুষ, অজস্র মানুষ, লক্ষ কোটি মানুষের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তাহলে এতক্ষণে তুমি বুঝতে পেরেছো যে, পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। কেন আমি মানুষের জন্যে চিন্তা করি মানুষের মাঝখানে থাকতে চাই আর মানুষকে ভালবাসি। তুমিও আজ থেকে আমার মত প্রতিজ্ঞা কর, তুমি মানুষের মাঝখানে থাকবে, মানুষকে ভালবাসবে, মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজকরবে। আর প্রতিজ্ঞা

কর, যারা মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষ-এর জন্য ভগবানকে কষ্ট দেয়, মানুষের ক্ষতি করে, তাদের তুমি ক্ষমা করবে না। কারণ আমি তাদের ক্ষমা করি না। ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না।

সেইজন্যে তোমাকে বলছি, বন্ধু, তুমি ভাবতে শেখ, মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন, তোমার মধ্যে ভগবান আছেন। সুতরাং ওঠ, জাগো, দুর্বলতা ত্যাগ কর, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস রাখ, বিশ্বাস কর, মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে একবার উঠে দাঁড়ালে দেখবে, তোমার সামনে আর কেউ দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় এতক্ষণে অর্জুন সোজা হয়ে বললেন, বন্ধু, তোমার উপদেশ আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে, আজ আমি বুঝতে পেরেছি, মানুষের কল্যাণের জন্যে যে যুদ্ধ, অন্যায়কারীকে নিধন করে শিষ্টকে পালন করার জন্যে যে যুদ্ধ তা' হিংসা নয়, তা'তে পাপ নেই।

আজ থেকে আমি আমার সমস্ত শক্তিকে দেশ ও দশের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করলাম। মানুষের সেবা, মানুষের কল্যাণই আজ থেকে আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য। আমার আর দুর্বলতা

নেই, নর-নারায়ণের কল্যাণে তুলে নিলাম এই তীর-ধনুক।

তীর-ধনুক নিয়ে শত্রুশিবিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলেন অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন অর্জুনকে। বললেন, মনে রেখো যেখানে অর্জুন আর কৃষ্ণ সেখানে জয় সুনিশ্চিত। বিশ্বাস রেখো, আমি অধর্মের বিনাশের জন্যে ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যে এই মাটির পৃথিবীতে যুগে যুগে নেমে আসি। ন্যায়, সত্যের প্রতিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণই আমার কর্তব্য—ভগবানের কাজ।
